© 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of
India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O Kantaganj- 741250

বিজ্ঞান অন্বেষক

DEEPAM
INFORMATION KIOSK
(A Govt. Forms Collection Centre)
Xerox, Lamination, Internet, Fax,
E-mail, STD/ISD, DTP
177, K.G.R. PATH, KANCHRAPARA
(Opp. Sri Laxmi Cinema)

বর্ষ-১ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারী ০৩ দাম ১টাকা

আমাদের কথা

বিজ্ঞান-- এই শব্দটি আজ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মানুষের চেতনার স্তরে স্তরে বিজ্ঞানের অবস্থান। বিজ্ঞান মানুষের চেতনার উন্নতি ঘটায়। মানুষকে সত্যের অনুগামী করে তোলে, ঘটনা প্রবাহকে যুক্তির নিরিখে ব্যাখ্যা করে। সংবেদনশীল দৃঢ় চেতনা সভ্যতা ও সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করে। যে কোনো সমাজে ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যতের কান্ডারী। তারা যাতে নিজেদের চারপাশকে জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং ভাবতে পারে তার জন্যই কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা আপনাদের পাশে পেতে চাই। আপনাদের মূল্যবান মতামত, সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।

বৃহস্পতির উপগ্রহ

মহাকাশ বিজ্ঞানী স্কট শেফার্ড এবং ডেভিড জিউইট সম্প্রতি বৃহস্পতির ১১টি নতুন উপগ্রহ আবিস্কার করেছেন। গত ২০০১ এর জানু: মাসে তাঁরা পৃথিবীর বৃহত্তম ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে এই উপগ্রহগুলি খুঁজে পান। নতুন উপগ্রহগুলি খুবই ছোট। এদের নিয়ে বৃহস্পতির মোট উপগ্রহের সংখ্যা হলো ৩৯টি।

তথ্য সূত্র- Down To Earth, June- '02.

এই জলাশয় গুলি কি ভরাট হয়ে যাবে?

পুকুর বোজালে কি হয়?

নন্টের সাথে ওর কাকুর জোর তর্ক বেঁধে গেছে। নন্টেকে তোমরা চেনো। নন্টে তোমাদেরই বন্ধু। ক্লাস টেনে পড়ে। পড়াশুনা খেলাধুলা সবেতেই তুখোড়। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে। প্রতিদিনের বিজ্ঞানের ব্যবহার যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। লাইব্রেরীতে ওর রোজকার যাতায়াত। এহেন নন্টে গুরুজন কাকুর সঙ্গে তর্ক করবে? ওর কাকু একজন বড় প্রোমোটার। অর্থাৎ যারা বসবাসের জন্য বহুতল বাড়ী নির্মান করে বিক্রী করেন। নন্টের কাকুরা শহর ও শহরতলীর শত শত পুকুর বা জলাশয় ভরাট করে সেখানে রাতারাতি বহুতল অট্টালিকা নির্মান করছেন। আর তাতেই যত গন্ডগোল, নন্টের যত আপত্তি। আমার সঙ্গে নন্টের দেখা হতে ওকে এই ব্যাপারে খুব উত্তেজিত অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম, 'কেন? পুকুর ভরাট করলে কি ক্ষতি?' ও বলল, 'ক্ষতি, ক্ষতি, সবটাই ক্ষতি। মানুষের ক্ষতি, জীবেদের ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, সবটাই ক্ষতি।' আমার বিশ্বাস হল না। বললাম, 'নন্টে ভাবোতো, কত মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া পুকুর থাকা মানেইতো আশেপাশের লোকজন পুকুর ব্যবহার করে নোংরা করবে। এর থেকে রোগ জীবানুও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর পুকুরতো একটা জলভর্তি বড়সড় গর্ত ছাড়া কিছুই নয়।' ওর অবাক দৃষ্টিতে আমার অজ্ঞানতাই যেন প্রকাশ পেল। বলল, 'ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের নাম শুনেছো?' ভাবলাম, পুকুরের মধ্যে আবার এসব কি? বললাম, 'একটু খোলসা করে বলতো?'

নন্টে বললো, 'পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও কোটি কোটি উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। আছে পারিপার্শ্বিক জড় পরিবেশ। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে ক্লার্ক, ওডাম প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবদের সঙ্গে ঐ স্থানের জড় উপাদানের আন্ত:বিক্রিয়ার

এর পর ৪ পাতায়

দূষণের কবলে খাদ্য

সবুজ শাক-সবজিতেভিটামিন ও প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। এই ভিটামিন ও খনিজ আমাদের পুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো শাক-সবজি খাওয়া যাবে না। দূষণ শাক সবজি ও ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আশেপাশের অঞ্চলে গমের উৎপাদন কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা গেছে, ধাপা ও বানতলার মাঠে যেসব ফসল চাষ হয় তাতে নিরাপদ মাত্রার থেকে অনেক বেশী মাত্রায় সীসা ও ক্রোমিয়াম আছে। গবেষকরা মনে করছেন ধাপার মাঠের জঞ্জাল এই অতিরিক্ত সীসা ও ক্রোমিয়ামের উৎস। অতিরিক্ত সীসা ও ক্রোমিয়াম দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করলে, বৃক্ক, স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা, জড়ত্ব দেখা দিতে পারে। যদিও এব্যাপারে আরো গবেষণার প্রয়োজন তবুও আমাদের এব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:- Science Reporter, May-'99.

অন্ধজনে দেহ আলো

বিল্টু ক্লাস নাইনে পড়ে। রবিবার সকাল বেলায় একমনে অঙ্ক কষছিল। এমন সময় তার প্রাণের বন্ধু গদাই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল তাদের পাড়ায় একটা ঘটনা ঘটেছে। পাশের বাড়ীর মনার দাদু মারা গেছে। দাদু নাকি চক্ষুদান করেছিলেন। সেই চোখ নিতে এসেছেন কয়েকজন। তাই নিয়েই ঝামেলা হচ্ছে। বিল্টু অবাক! চক্ষুদান করা মানে তো চুরি করা, বাংলা বইতে লেখা আছে। গদাই অধৈর্য হয়ে বলল,' আরে না মনার দাদু তার আসল চোখ দুটো দান করেছিলেন।' বিল্টু অঙ্ক বই বন্ধ করে বলল- 'কিন্তু দাদুর চোখ কি কাজে লাগবে?' গদাই বলল-' জানিনা, তবে ওরা বলছিলেন তাড়াতাড়ি চোখ দুটো তুলতে হবে, না হলে কাজে লাগবে না।' বিল্টু বই গুটিয়ে বলল, ' চল চোখ তোলা দেখি।' মাকে বলে গদাই এর সাথে বিল্টু হাজির হল মনার বাড়ী। গিয়ে দেখে, যারা চোখ নিতে এসেছিলেন তারা ফিরে গেছেন। মনার বাবা, কাকারা চোখ তুলতে দেননি। মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে বিল্টু বাড়ী ফিরে এল। হঠাৎ তার মনে পড়ল ডাক্তার জেঠুর কথা। ডাক্তার জেঠু তাদের বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে থাকেন। জেঠুর কথা শুনলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। বিকালে ফুটবল না খেলে গদাইকে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে গেল ডাক্তার জেঠুর বাড়ী। জেঠু একটা মোটা বই পড়ছিলেন। ওদের দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার?' বিল্টুসকালের ঘটনাটা জানানোর পরে বলল,'কয়েকটা প্রশ্ন আছে'। ডাক্তার জেঠু বললেন, 'একটা কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে ফেলো।' বিল্টুএকটা কাগজ নিয়ে প্রশ্নগুলো লিখে ফেলল। ডাক্তার জেঠু প্রশ্ন ধরে ধরে উত্তর দিলেন।

চক্ষুদান কি?

চক্ষুদান এক সামাজিক কর্তব্য। কোনো মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় অঙ্গীকার পত্রে সই করে জানান যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তার চোখ দুটো তুলে নেওয়া যাবে। এটাই চক্ষুদান।

সবাই কি অঙ্গীকার পত্রে সই করতে পারে?

প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সবাই অঙ্গীকার পত্রে সই করতে পারে।

দান করা চোখ কি কাজে লাগে?

দান করা চোখ থেকে কর্ণিয়া তুলে অন্য মানুষের চোখে বসানো হয়। একে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন বলে।

কর্ণিয়া কি?

আমাদের চোখের আকার গোল বলের মতো। চোখ বলতে আমরা যা দেখি তা গোল চোখের সামনের দিকের কিছুটা অংশ। এই সামনের দিকে একটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ আবরণ আছে। এর নাম কর্ণিয়া।

কর্ণিয়ার কাজ কি?

স্বচ্ছ কর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে সহজেই আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করে। ভালো করে বললে বলতে হয়, কর্ণিয়া চোখের প্রতিসারক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। চোখের ভিতরে আলো যায় বলেই আমরা দেখতে পাই। চোখ বন্ধ করলে চোখের ভিতরে আলো যায় না তাই দেখতে পাই না। কোন কারণে কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে গেলে ঘোলাটে হয়ে যায়। ফলে আলো কর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে পারে না, আর দেখাও যায় না।

কর্ণিয়া নষ্ট হয় কেন?

কর্ণিয়া নষ্ট হয় ক্ষত, অপুষ্টি, আঘাত, ক্ষয় প্রভৃতি কারণে। ভারতে অন্ধ মানুষের সংখ্যা প্রায় ১কোটি ২০ লক্ষ। এদের মধ্যে ২৫ লক্ষ মানুষ কর্ণিয়ার রোগের জন্য অন্ধ। এই ২৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের কর্ণিয়া বদলে দিলে এরা আবার দেখতে পাবেন।

যে কোন স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবহার করলে কি ফল পাওয়া যাবে না?

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বচ্ছ বস্তু ব্যবহারের ধারণা গড়ে ওঠে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁদুরের ক্ষেত্রে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়। পরীক্ষা সফল হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্য প্রণীর কর্ণিয়া মানুষের চোখে লাগানো হয়। পরীক্ষা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের চোখের কর্ণিয়া ব্যবহার করে পুড়ে যাওয়া কর্ণিয়া বদলে সফলভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। এখনও পর্যন্ত যা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তাতে বলা যায় অন্য কোন স্বচ্ছ বস্তু বা অন্যপ্রাণীর কর্ণিয়া ব্যবহার করে কর্ণিয়ার রোগের অন্ধ মানুষের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। মানুষের চোখের কর্ণিয়ার মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে।

মৃত্যুর পরে চোখ তোলার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি?

মৃত্যুর চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে চোখ তুলতে হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর ছয় ঘন্টার মধ্যে চোখ না তুললে সেই চোখ কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনে কাজে লাগে না। চোখ তুলে নেওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতালে। এখন অবশ্য কিছুক্ষনের জন্যে তুলে নেওয়া চোখ সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা আছে।

কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটা?

ঠিকঠিকভাবে দাতা, গ্রহীতার শারীরিক অবস্থা মিলে গেলে ১০০ জনের মধ্যে ৮৫ থেকে ৯০ জনের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।

সম্পূর্ণ চোখ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফেরানো যায় কি ?

এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ চোখ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর পরীক্ষা সফল হয়নি। তবে মনে রাখা দরকার কর্ণিয়ার রোগে অন্ধ মানুষদের ক্ষেত্রে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনই একমাত্র সফল চিকিৎসা পদ্ধতি। আর এরজন্য দরকার মৃত মানুষের কর্ণিয়া যা সে নিজের ইচ্ছায় দান করবে।

মানুষতো রক্তদান করে, কিন্তু চক্ষুদান করে না কেন?

এখনো এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে। অনেকে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁদের ধারণা চক্ষুদানের ফলে অঙ্গহানি ঘটবে। রয়েছে ধর্মীয় কারণ। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা চোখ নিতে দেননা। আর একটা কারণ, অনেকেরই এবিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই। চক্ষুদান ব্যাপারটা কি বা দান করা চোখ কি কাজে লাগতে পারে সে সম্পর্কে জানেননা। প্রত্যেক মানুষেরই ভাবা উচিত, মৃত্যুর পরে এই দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু চোখকে বাঁচানো যেতে পারে চক্ষুদানের মাধ্যমে। আমার চোখ অন্য আরেক জনের সামনে খুলে দিতে পারে আলোর দরজা।

বিল্টুডাক্তার জেঠুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে- - সে বোঝাবে তার আশেপাশের সবাইকে। আর বড় হয়ে সে একটা কাজ করবে সেটা হল চক্ষুদান।

তথ্যসূত্র:- Cornea Trananssplantation. Prof. Ranabir Mukherjee, Corneal Graftins. Dr. K.K.Sarkar.

--শিবপ্রসাদ সরদার

মরণোত্তর চক্ষুসংগ্রহ

গত ৬ জানুয়ারী হালিসহর মল্লিকবাগ কলোনীর প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ রায় এর একজোড়া চক্ষু বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা সংগ্রহ করে ডাঃ এ.কে.দাসের (জে.এন.এম. হাসপাতাল, কল্যাণী) সহায়তায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছেন। মেডিকেল কলেজের আই ব্যাঙ্ক (Regional Institute of Ophthalmology, Medical College & Hospital, Govt. Of W.B. Kolkata-73.Memo No; RIO-EB/2003/35 dtd. Kol.the 7.1.2003.) সরকারীভাবে জানিয়েছেন যে প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ রায়ের কর্ণিয়া দুটি সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। চক্ষুসংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়াতের পুত্র নৃপেন রায় এবং কন্যা আভা রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রয়াতের স্মরণসভায় স্থানীয় মানুষ চক্ষুদানের বিষয়ে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন। চক্ষুদানের বিষয়ে আগ্রহীদের কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য
আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
লক্ষী সিনেমা,
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে

প্লাস্টিক দূষণ ও বিকল্প

প্লাস্টিকের ব্যবহার : প্লাস্টিকের ক্রমবর্ধমান দুনিয়াজোড়া ব্যবহারের মূলে রয়েছে আপাত অর্থনৈতিক ও ক্রেতার মানসিক গঠন ও সামগ্রিক জীবন দর্শন। ব্যবহারের মূল কারণ এটি ক্ষয়রোধী অভঙ্গুর ও জলনিরোধক। সুলভে প্লাস্টিককে মনমুগ্ধকর রঙে ও আকৃতিতে উৎপাদন করা যায়। প্লাস্টিক ব্যবহারের অন্যতম কারণ হল সহজে বহনযোগ্য এবং সহজলভ্য।

প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয় শিশি বোতল, পলিথিনের পাইপ, কৃষিপন্য ও দুগ্ধ পরিবহনে ক্যারিব্যাগ হিসেবে। এছাড়া চেয়ার, টেবিল,ব্ল্যাকবোর্ড, আয়না, ফটো, টি.ভি., রেডিও ও টেপের ক্যাবিনেট হিসেবে বর্তমানে প্রচুর পরিমানে প্লাস্টিকের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ইদানিং দরজা, জানলা, ও তার ফ্রেম এবং বস্ত্রশিল্পের ববিন হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার দেখা যায়।

প্লাস্টিকের বিপদ : বর্তমানে দুধ, তেল, ওষুধ, কাটা মাছ-মাংস, মিষ্টি সহ বাজারের অধিকাংশ জিনিসপত্রই প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বা মোড়কে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরাও ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য রঙ-বেরঙের প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করে থাকেন।

আমাদের দেশে যে সস্তা ধরনের পলিপ্যাকের প্রচুর ব্যবহার, তার প্রতি ১ কেজিতে প্রায় ২৫ গ্রামের মত সীসা থাকে যা অতি সহজেই খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে যায়। এমনকি রান্নার আগে ভাল করে ধুয়ে ফেললেও তা দূর করা প্রায় অসম্ভব। এক সমীক্ষায় জানা যায় প্লাস্টিকের আধারে সরবরাহ করা ভোজ্যতেল এবং বনস্পতির অর্ধেকের বেশি প্লাস্টিক দূষণের শিকার। আবার অনেকে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করার পর ফেলে দেবার পর পিছনের দরজা দিয়ে সেগুলি জীবানুমুক্ত না হয়ে নতুন মোড়কে চলে আসে খোলা বাজারে।

নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ব্যবহার করা পলিব্যাগ, প্লাস্টিকের আবর্জনা স্তুপ করাও যথেষ্ট আপত্তিজনক। এই সমস্ত আবর্জনাকে পোড়ালে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কার্বন, সালফার, নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ এবং ফিউরান ও ডাই অক্সিন নামক বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে। প্লাস্টিকের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকর পিভিসির বিষ ডাই অক্সিন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী গ্যাসের মধ্যে ডাই অক্সিনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যৌগটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে এবং প্রজনন ক্ষমতারও ক্ষতি করে।

এই সমস্ত প্লাস্টিকের আবর্জনাকে মাটিতে চাপা দেওয়া বিজ্ঞান সম্মত নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের একটি টুকরোও যদি মাটিতে পরে থাকে, অন্যান্য আবর্জনার মত বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটিতে মিশে যায় না। অর্থাৎ প্লাস্টিক নন বায়োডিগ্রেডেবল্। প্লাস্টিককে যদি মাটিতে চাপা দেওয়া হয় তবে এটা জমির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়।

একটি ঘোষণা

আপনার বা আপনার পুত্র-কন্যার স্মৃতিশক্তি কি দুর্বল? কিছু মনে রাখতে পারছেনা। আপনার পুত্র-কন্যার পাঠ্যবিষয় মনে থাকছেনা। ওষুধ ছাড়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটানো

যোগাযোগ:- **TARAK PAUL**
(1p.m. to 3pm,10pm to 6am).
ভর্তি চলিতেছে। ☎ 2588-0821

বিকল্প : প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে, উন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতে এর সমস্যা ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্তমানে এই প্লাস্টিক দূষণ থেকে রেহাই পেতে হলে প্লাস্টিকের বিকল্প অবশ্যই খোঁজা দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে পারে। যেমন প্লাস্টিকের চায়ের কাপের পরিবর্তে চিনা মাটির কাপ বা মাটির ভাড় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে চট বা কাপড়ের টেকসই জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে। সমগ্র বিশ্বে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার ছেয়ে গেছে অথচ আমরা জেনেছি, এই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করা কতটা অপকারী! আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, প্রধানতঃ কৃষি নির্ভরশীল দেশ। ভারতে প্রচুর পরিমানে পাট উৎপাদিত হয়ে থাকে। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে যদি পাটের ছোট বড় সুন্দর থলে বা ব্যাগ ব্যবহার করা হয় তবে আমাদের দেশ এই দূষণ থেকে মুক্ত হবে অপর দিকে আমাদের দেশীয় কৃষিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এ বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনার অভাব আছে।

প্লাস্টিক দূষণমুক্ত পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন এক সঠিক জীবন দর্শন। আমরা ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলব এই মানসিকতার পরিবর্তে ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারের মনোভাব নিয়ে সযত্নে জিনিসের ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতির ভান্ডার আমাদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের লোভ মেটাতে পর্যাপ্ত নয়। আমাদের উন্নয়নের ধারণা প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে করলে চলবে না, গড়ে তুলতে হবে এক জীবনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা।

-- পলাশ ভট্টাচার্য্য

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান

১৯২৪ সাল। জার্মানীর Zeit fur phys পত্রিকায় একটি চার পাতার ছোট্ট প্রবন্ধ বেরলো। লেখক পরিচয় অসম্পূর্ন-- ভারতের (ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের) বোস। প্রবন্ধটি অনুবাদ মাত্র। অনুবাদক আইনস্টাইন স্বয়ং। এই লেখাটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল একটি চিঠির অংশ হিসাবে ইংরাজীতে। জহুরী জহর চিনলেন। চিঠির বিশেষ অংশটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে তাঁর নিজের মন্তব্য জুড়ে দিলেন "আমার মতে প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রমানে বোসের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদে প্রযোজ্য করে যা আমি অন্যত্র দেখাব।"

এবার শুরু থেকে শুরু করা যাক্। সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন অধ্যাপক, সেই সময় মেঘনাদ সাহা একটি সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমস্যাটির বিষয় এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এর সমাধান করতে গিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নামাঙ্কিত সংখ্যায়ন রচনা করেছিলেন। তাপ, আলো ইত্যাদি বিকিরণের আদর্শ উৎসকে কৃষ্ণবস্তু (Black Body) বলা হয়। এটি যেমন আদর্শ বিকিরক, তেমনি আবার আদর্শ শোষকও বটে। শীতল অবস্থায় এর উপর আপতিত সমস্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকেই এ যেমন শোষন করে তেমনি আবার উত্তপ্ত অবস্থায় সমস্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকেই নি:সরণ করে। তবে আদর্শ কৃষ্ণবস্তু বাস্তবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানী Wien এবং কিছুকাল পরে বিজ্ঞানী Rayleigh এবং Jeans কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সংক্রান্ত কয়েকটি সূত্র দেন যেগুলি কেবল দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। ১৯০০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি বললেন, বস্তু থেকে যখন শক্তি (তাপ) নির্গত হয় তখন তা' নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয় না-- বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি প্যাকেটরূপে নির্গত হয়। তিনি এই প্যাকেটগুলির নাম দেন কোয়ান্টা।

এরপর ৭ এর পাতায়

পুকুর বোজালে কি হয়?

১ পাতার পর

ফলে যে অনুকুল বসবাসরীতি ও উপযোগী সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।' বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এখানে মানুষ ছাড়াও অন্য সদস্য বা উপাদান রয়েছে যাদের বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারবে না। যেমনি পুরো পৃথিবীটাই একটা বাস্তুতন্ত্র গঠন করেছে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ যেমন অরণ্য, সমুদ্র, মরুভূমি, জলাভূমি, পুকুর, এমনকি এক চিমটে মাটির মধ্যেও পৃথক পৃথক বাস্তুতন্ত্র সঠিত হয়ে রয়েছে।'

নন্টে বললো, 'তোমার সেই বড়সড় গর্তটাতেই আছে জড় উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত দ্রবীভূত খনিজ লবন। এছাড়া অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসগুলিতো আছেই। আছে জৈব উপাদান হিউমিক অ্যাসিড এবং ভৌত উপাদান আলো, বায়ু, উষ্ণতা। সবগুলিই দরকার।' এসবের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করার আগেই নন্টে বলল, 'আছে সজীব উপাদান উৎপাদক। অনেকসময় পুকুরের জলকে যে সবুজাভ দেখায় কারণ ওতে আছে অসংখ্য অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। এরা প্রতি লিটার জলে লক্ষাধিক থাকে। বড় পুকুরে এর সংখ্যাটা বোঝ একবার। পুকুরের কচুরিপানা, পাতা শ্যাওলা, হাইড্রিলা, পদ্ম ইত্যাদি বৃহদাকার উদ্ভিদও উৎপাদকের মধ্যেই পরে।' আমি বললাম, 'এদের উৎপাদক বলছ কেন?' বলল, 'এরা একটা বিরাট কাজ করছে যার জন্যে আমরা প্রাণীরা সবাই এদের ওপর সম্পূর্ন নির্ভর করে আছি'- সেটা কি? 'খাদ্য তৈরী। একমাত্র এরাই খনিজ লবন, জল, দ্রবীভূত গ্যাস ও আলোকে ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতির সাহায্যে মহামূল্যবান খাদ্য তৈরী করে। এরাই সমস্ত শক্তির মূল উৎস সূর্যালোককে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে। আবার এই পদ্ধতির ফলে সব জীবের প্রাণবায়ু মূল্যবান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। দমে গেলাম, বললাম, 'হুস। তা আর কিছু আছে নাকি?' 'আছে না! অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক অসংখ্য জুপ্ল্যাঙ্কটন যেমন জলজ পতঙ্গের লার্ভা, ড্যাফনিয়া, সাইক্লপ ইত্যাদি পতঙ্গরা। বললাম, 'তা থাকলেই বা কি? পরস্পরের সম্পর্ক কি?' বলল, 'আছে। আছে। এরাইতো উৎপাদককে খায়। তাই এদের প্রাথমিক খাদক বলে।' 'অন্য খাদকও আছে নাকি?' 'আছে না! ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতিতো আবার প্রাথমিক খাদককে খায়। তাই এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক। আর বাঙালীর খাবার পাতে থাকে যে সব মাছ যেমন বোয়াল, ভেটকি, সাল, সোল প্রভৃতি বড় বড় মাছ তৃতীয় শ্রেনীর খাদক।' সঙ্গে সঙ্গে আমি যোগ করলাম 'কারন এরা দ্বিতীয় শ্রেনীর খাদককে খায়।' 'ঠিক। - নন্টের উত্তর। বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে সূর্যের যে আলোক শক্তি উৎপাদকের মাধ্যম পুকুরে এসেছিল তা খাদ্য খাদকের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ক্রমিক পর্যায়ে সমস্ত প্রাণী গোষ্ঠিতে প্রবাহিত হয়েছে। একেই খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

'আবার অনেকগুলি খাদ্যশৃঙ্খল মিলে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের দ্বারা আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে পুকুরে খাদ্য জাল গঠন করে।' ততক্ষণে আমার মনে নানা প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। বললাম। 'এই যে পুকুরে শত শত জীবের উপস্থিতি, এদের মৃত্যু হলে তো পুকুরটা এমনিতেই ভরাট হয়ে যাওয়ার কথা।' নন্টের প্রত্যুত্তর, 'প্রকৃতির রাজ্যে সকলেই সুশৃঙ্খল। এক্ষেত্রে কাজে নেমে পড়ে বিয়োজকরা। অর্থাৎ পুকুরের মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবাণু, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক প্রোটোজোয়া। এরা মৃত জীবকে ভেঙ্গে পুনরায় অজৈব বস্তুতে পরিনত করে। সেই বস্তুগুলিকে আবার উৎপাদক তার খাদ্য তৈরীতে কাজে লাগায়। ফলে পুকুরের প্রকৃতিতে সবসময় থাকে একটা ভারসাম্য যা মানুষের হস্তক্ষেপে তছনছ হয়ে যাচ্ছে।' নন্টের যুক্তির জালে যখন আমি দিশেহারা তখন নন্টে বলল, 'এটাতো পুকুরের ভিতরের ক্রিয়াকলাপ। এটাই শেষ নয়। জলাভূমি বোজালে মানুষের প্রত্যক্ষভাবে যে যে ক্ষতি হবে সেগুলি হল ঃ--

১. বাতাসে অক্সিজেন কম ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেশী হওয়ায় পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। ২. বৃষ্টির জল কোথাও জমতে না পারায় বন্যা দেখা দেবে। লবনহ্রদ বুজে শহর পত্তন কোলকাতার বন্যার একটা প্রধান কারণ। ৩. আমাদের পানীয় ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। কিন্তু বিকল্প বিশুদ্ধ জল পাব না। ৪. সাঁতারের মাধ্যম শরীরচর্চা হবে না। ৫. তাজা শাক সব্জী পাব না। ৬. মাছ ডিমের উৎপাদন কমে যাবে। ৭. জল যে বিষাক্ত গ্যাস টেনে নেয়, সেগুলি বাতাসে থেকেই যাবে। ৮. প্রকৃতির থেকে দূরে সরে যাওয়ায় মনোরোগী বেড়ে যাবে। নানা রোগের শিকার হবে মানুষ। ৯. বাসস্থানে আগুন লাগলে জল না পাওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়বে। 'থাক। থাক।'- নন্টেকে থামাতে বাধ্য হলাম। কারণ ততক্ষণে পুকুর বোজানোর ভয়ংকর বিপদের দিকটা আমার মাথায় এসেছে। বললাম, 'সরকার কি এসব জানে না?' নন্টে বলল, 'কে বলল জানে না' তার জন্য প:ব: ইনল্যান্ড ফিসারিজ আইন ১৯৮৪, প:ব: ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৬ ইত্যাদি এবং সম্প্রতি প:ব: জল সম্পদ পরিরক্ষন, সংরক্ষন, বিকাশসাধন নামে একটি বিল অনুমোদিত হয়েছে। এগুলির দ্বারা ৫ কাঠা বা তার বেশী মাপের পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে। মন্ত্রী মহাশয়রা বারবার পুকুর বোজানোর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন।' বললাম, 'কিন্তু এতে শাস্তি হবে কি?' 'অবশ্যই। দোষী সাব্যস্ত হলে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের জেল অনিবার্য।' বললাম, 'কিন্তু এখানে বিঘার পর বিঘা জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা কোন জলাজমিই আর আস্ত রাখবে না। পারলে গঙ্গাটাকেই না ভরাট করে দেয়।' নন্টে এই প্রথম আমার সঙ্গে সহমত হল। বলল, 'মুশকিল কি জান আমার কাকুর সঙ্গে সমাজের অনেক মান্যগন্য ব্যক্তির বন্ধুত্ব আছে। আমিও আজ পর্যন্ত কারুর শাস্তি হয়েছে বলে শুনিনি। এটা কিরকম জান। রহস্য গল্পের শেষে যেমন থাকে। কি হইতে কি হইল মোহন পালাইল।' মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে নন্টের বয়সী এক কিশোরের উক্তি ঃ

'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস এল। কখন যেন নন্টের উত্তেজনা, হতাশা, রাগ আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। চলে আসার পরও যেন নন্টের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে -- কেন বুকভরে প্রাণবায়ু নিতে পারব না? কেন জলে ঝাঁপিয়ে অদ্ভুত সুন্দর ডেফনিয়া, সাইক্লপদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে পারব না? কেন প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাব না? কেন? কেন? কেন?

--- তাপস মজুমদার।

সাক্ষাৎকার

ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়– আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রথমজীবনে শিক্ষক ছিলেন। আজো তিনি সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তাঁর ছাত্র জীবনের কথা, চিন্তা ভাবনা পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে এই আশায় এই সাক্ষাৎকার।

বিশিষ্ট আকাশবিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছু সময়

বি.দ. প্রশ্ন :- স্যার আপনার জন্মস্থান ও প্রাথমিক পড়াশোনা কোথায়?

অ.ব. উ :- আমার জন্ম ১৯৩০ সালে হাওড়া জেলার দক্ষিনে বাগনানের পাঁচ মাইল দূরে মুগকল্যান গ্রামে। আর ঐ গ্রামের মুগকল্যান হাইস্কুলে আমার ছাত্র জীবনের বেশ কিছু বছর কাটে। এবং ঐ স্কুল থেকেই ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি।

প্র:- আপনার বাবার নাম কি ছিল এবং তিনি কি করতেন?

উ:- বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি পেশায় ছিলেন স্কুল শিক্ষক। (মুগকল্যান হাইস্কুল)

প্র:- ম্যাট্রিকুলেশনের পরে আপনার পড়াশোনা কোথায়?

উ:- এই প্রসঙ্গে বলি আমার বাবা ছিলেন মাত্র ৩০ টাকা বেতনের স্কুল শিক্ষক, যার ফলে কলকাতায় থেকে বড় বড় স্কুলে বা ছাত্রাবাসে টাকা দিয়ে পড়াশোনা করার ক্ষমতা আমার ছিলনা। আর তখনই আমাকে কলকাতা ছেড়ে চলেযেতে হল অনেক দূরে বেনারসে। সেখানে আমি আমার মায়ের বাবা অর্থাৎ দাদুর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা শুরুকরি। আমি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে IA, B.Sc এবং M.Sc পাশ করি ফলিত অঙ্ক নিয়ে। (Applied Mathematics)

প্র:- পড়াশোনা করার জন্যে তাদের থেকে কিরকম সাহায্য পেয়েছিলেন?

উ:- পড়াশোনা করার জন্যে আমাকে ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছে। আমার দাদু আমার থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু অন্যগুলো আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার দাদুর বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব ছিল ৬ কিলোমিটার। আর আমার জুতো ছিল মাত্র একজোড়া। ছয়,ছয় বারোকিলোমিটার জুতো পরে গেলে জুতো ক্ষয়ে যাবে, এই ভয়ে জুতো হাতে করে নিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢোকার আগে কলে পা ধুয়ে আবার জুতো পরে ভিতরে ঢুকতাম। পড়াশোনার বেশিরভাগ খরচা চালাতাম টিউশনি করে।

প্র:- এখনতো আপনাকে সকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে জানে, তা এই বিদ্যা কিভাবে শুরু করলেন?

উ:- এই নিয়ে বলতে গেলে কিছুটা বলতে হয়, যখন আমি Applied Math পড়ি তখন আমাদের Head of the Department ছিলেন এক ঋষিতুল্য মানুষ অধ্যাপক ভি.ভি. নারলিকার– জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের বাবা। নারলিকার নিতেন অ্যাস্ট্রোনমির ক্লাস। এমন একজন অধ্যাপকের ক্লাস করতে পারবোনা, এইভেবে আমরা চারজন বিশেষ বিষয় হিসাবে অ্যাস্ট্রোনমিকে বেছে নিলাম। তাঁর বোঝাবার ধরণ ধারণ দেখতে দেখতে আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানে ঢুকে গেলাম।

প্র:- M.Sc পাশ করার পর আপনি কি পড়াশোনা করেছিলেন, না চাকরি?

উ:- M.Sc পাশ করার পর আর Phd. করা হয়নি। তার একটাই কারণ তখন আমার একটা চাকরির খুব প্রয়োজন ছিল। আর এই চাকরি না করলে ছোট ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হবে না। তাই তখন আমি ওখানকার D.A.V. কলেজে ১৮২ টাকা মাহিনার চাকরি নিলাম। এই কলেজে সাড়ে চার বছর পড়াই। এই সাড়ে চার বছরের তিন বছর অতিক্রম হওয়ার পরে একবার দু'মাসের গরমের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এলাম। তখন মা আদেশ করলেন 'দ্যাখ মন্টু, তোরতো M.Sc. ডিগ্রি আছে, তুইতো Scientific Service (UPSC) -এর পরীক্ষা দিতে পারিস।' মায়ের আদেশ অনুসারে UPSC পরীক্ষার বসে ইন্ডিয়ান মেটেয়রলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট-এ মেঘনাথ সাহার তৈরী নটিক্যাল অ্যালম্যানক ইউনিটের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বিভাগের জুনিয়ার বিজ্ঞানীর চাকরি পাই। ১৯৫২ সালে মেঘনাথ সাহার ক্যালেনডার রিফর্ম কমিটিতে আমার থাকার সুযোগ ঘটে। আর এই ক্যালেনডার রিফর্ম কমিটিতে কাজ করতে করতে আমি প্রমোশন পাই এবং সিনিয়ার বিজ্ঞানী হয়ে অ্যাভিয়েশন রিসার্চ Department-এ চলে যাই।

প্র:- পেশাগত দিকে থাকতে থাকতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কিছু ভেবেছিলেন বা তারজন্যে কি করেছেন?

উ:- এই নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আমি অ্যাভিয়েশন রিসার্চ-এ ১৯৬২-৬৮ সাল পর্যন্ত ছিলাম, এখানে কাজ করতে করতে নটিক্যাল অ্যালমানাক ইউনিটের ইন-চার্জের পদ শূন্য হয়। এই পদ পূরণের জন্যে আবার পরীক্ষা হল, মোট ২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে থেকে আমি নির্বাচিত হয়ে এই ইউনিটের সায়েন্টিফিক অফিসার ইন-চার্জ হই। এই পদে থাকাকালে বহু বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হই। এই ইউনিটের একজনকে আমি টানা ৬ বছর হাতে ধরে অ্যাস্ট্রোনমির বিভিন্ন বিষয় শেখাই, কিন্তু একটি চক্র তাকে বদলি করিয়ে একজন ৫৪ বছর বয়স্ক মেটেয়রলজির লোককে এই পদে নিয়ে এল। তখন থেকেই আমার সংগ্রাম শুরু হল। মেঘনাথ সাহার তৈরী করা এরকম একটা অ্যাস্ট্রোনমির সেন্টার নষ্ট হয়ে যাবে আর তা আমি বসে দেখব? সেই থেকে ভাবনা শুরু করলাম এই সেন্টারকে এখান থেকে তুলে একটা আলাদা সেন্টার বানাতে হবে, যা কিনা এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়, জাপানের পর। সেই সময় সাংসদ ছিলেন অধ্যাপক হীরেণ মুখোপাধ্যায়, আমি সময়করে একদিন সব কথা বলে ফেললাম। তখন তিনি আমাকে অ্যাস্ট্রোনমির সমস্ত তত্ত্ব নিয়ে একটি সবিস্তার রিপোর্ট তৈরী করতে বললেন। তার কথা মত সমস্ত তত্ত্ব নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করে সাংসদকে দিয়ে এলাম। সাংসদ সময় করে তা নিয়ে গেলেন সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। এর পরই সাংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় ১৯৮০ সালে নিউ আলিপুরে তৈরী হয় অ্যাস্ট্রোনোমির নিজস্ব সেন্টার – পজিশোনাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সেন্টার। আর এই সেন্টারের প্রথম ডাইরেক্টর হই আমি। এই দিক দিয়ে বলতে গেলে মেঘনাথ সাহার একান্ত ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পেরেছি। এই সেন্টারে আমি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত থাকার পর অবসর গ্রহণ করি। (৫৮ বছর হয়ে যাওয়ায় অবসর নিতে হয়)

প্র:- অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোলজি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবেন?

উ:- আমাদের এই বিশাল পৃথিবী, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, তারা নিয়ে মহাবিশ্ব। এই তারাগুলো জ্বলছে কেন, পৃথিবীর জন্ম হল কিভাবে, রাতের আকাশে যে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে এর স্বরূপ কি, এরা কিভাবে এল, এইযে সবগ্রহ- মঙ্গল, বৃহস্পতি এদের দেখতে কেমন, এদের কাজকি, এই সবের

এরপর ৬ এর পাতায়

সাক্ষাৎকার

৫ পাতার পর

দীর্ঘ ইতিহাসই হল জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনমি। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পূর্ণ একটা বিজ্ঞান, এর পেছনে আছে অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, যুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যা। এখানে কোন বুজরুকির ব্যাপার নেই। আর জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যাপারটা এইরকম-- একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করল সেই সময়কার কয়েকটি গ্রহ ও সূর্যকে নিয়ে একটি কাল্পনিক জন্মছক তৈরী করে জ্যোতিষীরা। যার পেছনে নেই কোন বিজ্ঞান, না যুক্তি। আর এই জন্মছক দিয়ে জ্যোতিষীরা অতি সহজেই বলে দিচ্ছে যে সে বড় হয়ে কি হবে, তার বিবাহ কিরকম হবে, তার চাকরি কেমন হবে বা তার মৃত্যু করে হবে এই সব অবৈজ্ঞানিক কাজকর্ম। আজ থেকে পাঁচহাজার বছর আগে ব্যাবিলন পুরোহিতরা সেই সময়কার রাজাদের ঠকাবার জন্যে বা টাকা রোজগার করার এইসব কাল্পনিক জন্মছক তৈরী করত। আর বর্তমানের জ্যোতিষশাস্ত্র পাথরের আংটি পরা শাস্ত্র, এই পাথরের সাহায্যে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে এরা, আর দুর্বল মানুষগুলোকে ঠকাচ্ছে।

প্রশ্নঃ- আচ্ছা আপনি যে এই কথাগুলো বলছেন, এতে আপনাকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

উঃ- কোন সত্যকথা বলতে গেলেতো বাধা পেতেই হবে। আর আমি ১৯৯১ সালে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে লিখি ইংরাজি দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকায়। পত্রিকায় লেখা বেরবার পর থেকে আমাকে অনবরত হুমকি দেওয়া হয়, আমাকে খুনকরা হবে বলে। স্ত্রীকে ফোন করে বলে আপনি কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হবেন। কিন্তু কোন হুমকিই আমাকে কাবু করতে পারেনি, আমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বুজরুকির বিরুদ্ধে বলব।

প্রশ্নঃ- আপনি সরকারী পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর কি করলেন?

উঃ- এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলতে হয়। অবসর নেওয়ার পর আমি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখতাম এবং লেখার শেষে লিখতাম অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। সেই সময় বিড়লা প্রধান এম.পি.বিড়লা একদিন স্টেটসম্যানে আমার লেখা পড়েন। লেখাপড়ার পর তিনি তার পারসোন্যাল সেক্রেটারিকে দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার কথা জানালেন পত্র মারফত। তার সঙ্গে দেখা করি এবং তিনি কলকাতায় অবস্থিত বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চের ইন-চার্জ হয়ে ঢুকতে বললেন। আর সেই ১৯৮৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ইনচার্জ।

প্রশ্নঃ- এই প্রতিষ্ঠানের ইন-চার্জ হতেপেরে আপনি কি করতে পেরেছেন?

উঃ- ভাল প্রশ্ন, এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে একটা কাজ করতে পেরেছি। কাজটা হল অ্যাস্ট্রোনমির উপর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স যা আমি যুক্ত হওয়ার পর করেছি। আর একটা জিনিস এখানে করতে পেরেছি, একটা সুন্দর লাইব্রেরী। সারাভারতে আর কোন প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কোর্স পড়ান হয়না।

প্রশ্নঃ- আপনিতো বলছেন জ্যোতিষীরা ভন্ড তবে কেন এত লোক তাদের কাছে যাচ্ছে?

উঃ- বর্তমান পরিবেশে আজ বহু মানুষই বিভিন্ন কারণে হতাশায় ভুগছেন। আর এই সব হতাশাকে দূর করার জন্যে তাঁরা অন্ধের মত চলে যাচ্ছেন জ্যোতিষীদের কাছে। চাকরি হচ্ছেনা, তারা বলে দিচ্ছে তা কোন সময় হবে। বিবাহ কোন সময় কিরকম হবে, তাও বলে দিচ্ছে। কঠিন রোগেরও বিহিত বের করছে এই জ্যোতিষীরা। আর এই সবের ওষুধ হল পাথর। যদি দিকে দিকে এরকম ধাপ্পাবাজি চলতে থাকে, তবে কেন জ্যোতিষীদের জ্যোতিষীদের কাছে ভীড় হবে না!

প্রশ্নঃ- একজন ছাত্র যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা আকাশ বিজ্ঞানী হতে চায় তবে তাকে কি করতে হবে?

উঃ- ছাত্রছাত্রীদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা আকাশবিজ্ঞানী হতে হলে তাকে অঙ্ক এবং পদার্থবিজ্ঞানের উপর বিশেষজোর দিতে হবে।

প্রশ্নঃ- আপনি এখন ছাত্রছাত্রীদের জন্যে কি করছেন?

উঃ- আমার সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের কুসংস্কারমুক্ত করা। আর তার জন্যেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি শহর থেকে গ্রামে। আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের বোঝাতে চাইছি কোনটা বৃহস্পতি, কোনটা শুক্র, কোনটা পৃথিবী, আবার কোনটা মঙ্গল। কি তাদের কাজ, কিরকম সব দেখতে এইসব গ্রহদের। যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে জ্যোতিষীরা তাদের ধাপ্পা দিচ্ছে। এইসব ছাত্রছাত্রীদের যদি আমি বোঝাতে পারি জ্যোতিষীদের নানারকম বুজরুকি তবে সেটা হবে আমার কাছে পরম পাওয়া। বড়দের বুঝিয়ে কোন লাভ নেই, তারাতো এক একটা ঝামা ইট। আমার একান্ত ইচ্ছা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বাংলায় একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভাল বই লিখে যাওয়া এবং তার কাজ আমি শুরু করে দিয়েছি।

প্রশ্নঃ- আমার শেষ প্রশ্ন, আজ আপনি প্রায় ৭৩ ভছরের আকাশবিজ্ঞানী, আজ পর্যন্ত আপনি আপনার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি কি পুরস্কার পেয়েছেন?

উঃ- ১৯৯৫ সালে আমি জাতীয় পুরস্কার পাই ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের তরফ থেকে। এই পুরস্কার পাই প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ভারতের গনমাধ্যমে তুলেধরার জন্যে। আর একটি পুরস্কার পাই ২০০২ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মেমরিয়াল পুরস্কার।' গত ২০ বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রচারের আলোকে তুলে ধরার জন্যে এই পুরস্কার।

অনুলিখন: শমিত কর্মকার।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন: জয়দেব দে, শমিত কর্মকার, পান্নলাল মনি, সুরজিৎ দাস। তারিখ- ১৬.১১.২০০২ (অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়িতে)

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

আমাদের চারপাশে তাকালে চোখে পড়ে নানা রকম গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়। অনেক সময় মনে হয় এদের সংখ্যা মানুষের থেকে বেশী। হ্যাঁ- পোকা মাকড়ের অনেকের সংখ্যাই মানুষের থেকে বেশী। আবার অনেক জীবের সংখ্যা খুবই কম। এত কম যে আগামী দিনে তাদের অনেককেই আমরা হয়ত আর এই পৃথিবীতে দেখতে পাব না। এরাই লুপ্তপ্রায় জীব। স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট হওয়ার ফলে এইসব জীবরা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ভারতে ৮১ ধরনের স্তন্যপায়ী, ৩৮ ধরনের পাখি, ১৮ ধরনের উভচর প্রাণী লুপ্তপ্রায়। এদের মধ্যে অনেককে একমাত্র ভারতেই দেখা যায়। তেমনই কয়েকজনের সঙ্গে আমরা পরিচয় করবো। এরা আমাদের মুখ চেয়ে আছে। বাড়ীর পোষা গরু, কুকুর, বিড়াল, পাখির মতো যদি এদের কথা ভাবি, তবে এদের বাঁচাটা অনেক সহজ হয়। এদের

এরপর ৭ পাতায়

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৩ পাতার পর

তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সম্পর্কিত সূত্র দেন। প্ল্যাঙ্কের এই সূত্রের সাহায্যে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সংক্রান্ত পরীক্ষালব্ধ ফলগুলিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বিস্তৃততর করলেন। তিনি বললেন, নিঃসরণ বা শোষনের সময়ই কেবল নয়, প্রবহমান অবস্থাতেও বিকিরণ থাকে কণারূপে। তিনি এই কণার নাম দিলেন ফোটন।

কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সম্পর্কে প্ল্যাঙ্কের সূত্র নির্ধারনে অসঙ্গতি ছিল। ফোটনের কেবল কণারূপকে নয়, তরঙ্গরূপকেও এজন্য ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্ল্যাঙ্ক নিজে এবং আইনস্টাইন, ডিবাই প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই অসঙ্গতি দূর করতে পারেন নি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার এই সমস্যার দিকেই মেঘনাদ সাহা সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এক নতুন পথে ফোটনের সংখ্যায়ন রচনার মাধ্যমে প্ল্যাঙ্কের সূত্র প্রমান করে "Planks's laws and light quantum hypothesis" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পত্রাকারে আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বহু বস্তু দিয়ে যদি কোন সমষ্টি গড়ে ওঠে, তাহলে প্রত্যেকটি বস্তুর বিষয়ে বিশদ তথ্য না জানলেও কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে সমষ্টির প্রকৃতি ও আচার আচরণ জানা যায় স্ট্যাটিসটিকস বা সংখ্যায়নের হিসাব পদ্ধতি ও যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। পূর্বে প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রমাণ করা হয়েছিল কণাদের পৃথক ভেবে কণা সংখ্যায়নের (Particle Statistics) উপর ভিত্তি করে। কোন শক্তিস্তরের সম্ভাব্য সূক্ষ্ম অবস্থা কত এবং ঐ শক্তি অবস্থাগুলি কিভাবে ফোটন কণা দ্বারা পূর্ণ হতে পারে তা'থেকে তাপগতিবিদ্যার সম্ভাবনা ইত্যাদি হিসাব করে তিনি প্ল্যাঙ্ক সূত্রের প্রমাণ দিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, সমান আকারের সমধর্মী ফোটন কণারা অভিন্ন এবং কোনো শক্তিস্তরে একাধিক ফোটন কণার অবস্থান সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের ফোটনগুলির ধর্ম সম্বন্ধে অনুমান এক নতুন পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কণাবাদের ভিত্তিতে ফোটনের সংখ্যায়ন রচনা করে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করলেন। এই পদ্ধতিতে প্ল্যাঙ্ক সূত্র নির্ণয়ে আর কোন অসঙ্গতি রইল না। বোসের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্ল্যাঙ্কের সূত্র প্রমাণের জন্য তিনি ফোটন কণাদের জন্য যে সংখ্যায়নটি দিলেন তা তাঁর নামানুসারে 'বোস সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত হয়। এই পদ্ধতিতে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টমবাদের রূপ কিরূপ ও কিভাবে তহবে তা' আইনস্টাইন দুটি প্রবন্ধে দেখালেন। আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদে বোসের পদ্ধতিতে আইনস্টাইন যে সংখ্যায়ন পেলেন তাকে বলা হয় বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন (Bose-Enstein Statistics)। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কোয়ান্টাম সংখ্যায়নিক গতিবিদ্যার সূত্রপাত হলো।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে প্ল্যাঙ্কের সূত্রটিই এক ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছিলেন। কোন সূত্রের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁর প্রবন্ধের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এর প্রকৃত গুরুত্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নতুন পদ্ধতিতে। এর প্রয়োগ অনেক ব্যাপক ও তাৎপর্য অনেক গভীর। বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বের (Epistomology) দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সন্তোষজনক। বোস সংখ্যায়নের গুরুত্ব পদার্থবিদরা আজও অনুভব করছেন। বিজ্ঞানী পি.এ.এম. ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিতে মৌল কণাদের দু'ভাগে বিভক্ত করেন। বোস সংখ্যায়ন মেনে চলা কণাদের নাম বোসন এবং ফার্মি সংখ্যায়ন মেনে চলা কণাদের নাম ফার্মিয়ন। গ্রাভিটন, ফোটন, পাই, মেসন প্রভৃতি কণা হলো বোসন এবং ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণা হল ফার্মিয়ন। বোস আইনস্টাইন ঘনীভবনের আভাষ তো বোস সংখ্যায়নেই পাওয়া গিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য অবদানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified field theory) সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা। এ বিষয়ে তিনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। গ্যাসের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য প্রচলিত সমীকরণটির একটি উন্নতরূপ তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন যেটি সাহা-বোস সমীকরণ নামে পরিচিত। সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কেলাসের গঠনপ্রণালী, পদার্থের চুম্বকত্ব, প্রতিপ্রভা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগে তাঁর পরিচালনায় এক্স-রশ্মির ক্ষেত্রে রামন ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, তাপদ্যুতির বর্ণালী বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়। তিনি এমন এক বর্ণালী ফটোমিটার উদ্ভাবন করেছিলেন, যার সাহায্যে ক্ষণস্থায়ী বর্ণালীরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। জৈব রসায়নের বহু গবেষনায় তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কুইনিন ও এমোটিন তৈরী করতে সচেষ্ট হন, যাতে এ দুটি ওষুধ সুলভে পাওয়া যায়। এক্স-রে ক্যামেরা তৈরী এবং তা'দিয়ে এক্স-রে ডিফ্রাকশন করা, তাপীয় বিকিরণ পোলারোগ্রাফি এবং সালফার ঘটিত ওষুধ তৈরী প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর কৌতূহল। সত্যেন্দ্রনাথ নিজের সৃজনশীলতা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ছিলাম ধূমকেতুর মতো যা জীবনে একবারই এসেছিল, আর ফেরেনি।"

--গোবিন্দ দাস

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

৬ পাতার পর

কথা আমাদেরই ভাবতে হবে, কারণ পৃথিবীটা আমাদের।

আমরা আজ যার সঙ্গে পরিচয় করবো তার বাড়ী অনেক দূরে-ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে। লোকে আদর করে ডাকে সিংহের লেজ ওয়ালা বানর (Lion tailed Macaque)। এর একটা পোশাকী নাম আছে যাকে বিজ্ঞান সম্মত নাম বলে। সেটা হল-- *Macaca silenus* (ম্যাকাকা সাইলেনাস)। নীলগিরি, আন্নামালাই, কার্ডামম পাহাড়, সাইলেন্ট ভ্যালি এবং পেরিয়ার অভয়ারণ্যে এদের দেখা যায়। এদের সারা দেহ কালো লোমে ঢাকা থাকে। মুখের চারপাশে ধূসর সাদা কেশর থাকে। এদের লেজের প্রান্তে একগুচ্ছ লোম থাকে। এদের লেজ সিংহের লেজের মতো দেখতে। শক্ত পোক্ত মাঝারি চেহারার এই বানরের পা গুলো ছোট। সামনের দিকে ঠেলে আসা গোল মুখ অনেকটা কুকুরের মতো। চোখের উপরে ভ্রুর কাছে হাড় অনেকটা উঁচু। চিবুকের নিচের চামড়া থলির মতো। এই থলিতে এরা খাবার জমা রাখে অবসর সময়ে চিবিয়ে খাবার জন্য। এরা গাছের ফল, পাতা, কুঁড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা খুব পরিশ্রম করতে ও কষ্ট সহ্য করতে পারে। বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যায় এরা বেঁচে আছে। এদের বেঁচে থাকাটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল কেরালায় সাইলেন্ট ভ্যালী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করার চেষ্টায়। তবে আশার কথা এই বানরের কথা চিন্তা করেই প্রকল্পটি বাতিল করা হয়। এই বেঁচে থাকার ব্যাপারটা এখন মানুষের হাতে।

কৌতূহল

এই বিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারে। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আমরা যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

প্রশ্ন:- ঘোড়াকে বিষাক্ত সাপে কামড়ালে মারা যায় না, কিন্তু মানুষ মারা যায় কেন?

সুচিত্রা মন্ডল, নবম শ্রেণী
পলাশী এ.ডি.পি. গার্লস হাইস্কুল।

উ:- সাপের কামড়ে মৃত্যু তখনই ঘটবে যখন বিষাক্ত সাপ মারণমাত্রার (লিথাল ডোজ) বিষ দংশন স্থানে ঢালতে পারবে। সুতরাং বিষাক্ত সাপে কামড় দিলেই মৃত্যু ঘটবে এই ধারনা ভুল। মারণ মাত্রার বিষ না ঢালতে পারলে মানুষও মারা যাবে না। সাপ কামড়েছে অতএব মৃত্যু ঘটবেই এই ভয়েই অনেক মানুষের হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যু ঘটে। মারণমাত্রার বিষ ঘোড়ার শরীরে প্রবেশ করলে ঘোড়ার মৃত্যু ঘটবে যদি চিকিৎসা না করা হয়। সাপের বিষের ওষুধ যা AVS (অ্যান্টি ভেনম সিরাম) নামে পরিচিত তা তৈরী করা হয় ঘোড়ার রক্ত থেকে। এক্ষেত্রে ঘোড়াকে মারণমাত্রার থেকে কম মাত্রায় সাপের বিষ ইনজেক্শন করা হয়। এইভাবে ক্রমাগত বিষের মাত্রা বৃদ্ধি করে মারণমাত্রার বিষ ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করালেও ঘোড়ার মৃত্যু ঘটে না, তার দেহে আগে থেকে বিষের অ্যান্টিবডি থাকার জন্য। এই অ্যান্টিবডি বিষের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

প্র:- ঝাড়ফুঁক করলে বা মাদুলি, তাবিজ, কবচ ইত্যাদির সাহায্যে কি মানুষের রোগ সারে?

এই প্রশ্নটি আমরাও ছাত্রছাত্রীদের কাছে রেখেছিলাম। আমাদের উত্তরের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর ও এখানে প্রকাশিত হল।

উ:- ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ, কবচের কোন রোগ সারানোর ক্ষমতা নেই। আমাদের শরীরের কিছু রোগ আছে যা স্বাভাবিক ভাবেই সেরে যায়। শরীর তার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রোগকে আটকায়। এই সব ক্ষেত্রেই ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ, কবচের কেরামতি দেখা যায়। রোগগ্রস্থ মানুষ সাধারণত মানসিক ভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে। এই দূর্বলতাকে কাজে লাগায় তাবিজ, কবচের কারবারীরা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রোগ সারলে মানুষ মনে করে তাবিজ, কবচের জন্যই এটা হল। মুখে মুখে প্রচারে তাবিজ কবচের মাহাত্য বাড়ে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর:

মদুলি,শেকড়-বাকড় যদি বাহুতে, গলায় ধারণ করলে রোগ সেরে যেত তাহলে তো নিত্যনতুন ওষুধও আবিষ্কার হত না। আমরা তা খেতামও না। মজার কথা এই যে যারা অসুখে বিভিন্ন শেকড় বাকড় ধারণ করেন তাঁরা কিন্তু ওষুধও একই সঙ্গে খেয়ে চলেন। কারণ তখন তাঁরা সবকিছুর ওপরই আস্থা হারান। যদি দৈবাৎ রোগ সেরে যায় তাহলে তাঁরা বলেন মাদুলির গুণে রোগ সেরেছে। আসলে এটা বুজরুকি।

অনুস্মিতা চন্দ, অষ্টম শ্রেণী,বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যা লয়।

প্রশ্নোত্তর

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার আয়োজিত 'গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী'র অন্তর্গত পর্যায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সচেতন করা। খাদ্যে ভেজাল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই সংখ্যায় বড়জাগুলি গোপাল অ্যাকাডেমি এবং হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজনের মতামত প্রকাশ করা হল। এই বিভাগটি নিয়মিত ভাবে থাকবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়ে সাতটি প্রশ্ন ছিল। আমরা দুটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি।

প্রশ্ন:- খাদ্যে ভেজাল বলতে কি বোঝ?

উ:- খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায় খাদ্যে যে প্রাকৃতিক উপাদান থাকা উচিত তার বদলে মানুষ সেই খাবারে বিভিন্ন রকমের জিনিস দিয়ে থাকেন। যার ফলে সেই খাদ্যের যে উপাদান, গুণমান এবং তার যে বৈশিষ্ট্য তা কমে যায়। একে বলা হয় খাদ্যে ভেজাল।

-- রাহুল কর, ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং -৩
বড়জাগুলি গোপাল একাডেমি।

প্রশ্ন:- ভেজাল প্রতিরোধে তুমি কি করবে?

উ:- ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের ভেজাল খাদ্য পুরোপুরি বর্জন করা উচিত। আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে বোঝাবো। ভেজালের কারবারীদের বোঝাবো। এর পরেও যদি তারা না শোনে তাহলে পুলিশকে জানাতে হবে। রঙিন খাবার দেখলে খাওয়া উচিত নয়।

-- সমীরন দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং - ৬
বড়জাগুলি গোপাল একাডেমি।

উ:- ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি ভেজাল বন্ধ করার জন্য একটা দল গঠন করি তাহলে সুবিধা হবে। লোকেদের রঙিন খাবার বা মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। বিক্রেতাদের রং ও ভেজাল দিতে মানা করতে হবে। সরকারের সাহায্যে আইনকে কঠোর করতে হবে। যদি বিক্রেতারা তবুও রং ব্যবহার করেন তবে তাদের অনুমোদিত রংগুলিই ব্যবহার করতে বলতে হবে।

-- বদরুল আলম, ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং - ৫
বড়জাগুলি গোপাল একাডেমি।

উ:- ভেজাল যাতে বন্ধ হয় তার জন্য আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে আমি চেষ্টা করব। ভেজাল বন্ধ করার জন্য ভেজালের জিনিসপত্র আমরা খাবনা। কেউ যাতে ভেজাল খাবার তৈরী করতে না পারে তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব, তাদের যেন অনুমতি না দেওয়া হয়।

-- রঞ্জিতা দত্ত, ষষ্ঠ শ্রেণী, রোল নং - ৩৭
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে (সাধারণ সম্পাদক, বিজ্ঞান দরবার) কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর২৪পরগনা থেকে প্রকাশিত এবং প্রতুল কুমার দাশ কর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪পরগনা থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার।
ফোন- ২৫৮৫-৬০৩২,২৫৮০-৮৮১৬,২৮৭৬০৭২০,২৮৪৬০৭৭৮, ২৫৮৮-০৮২১।